মধ্যবিত্তশালী দেশ হিসাবে বাংলাদেশ:
এই স্বপ্ন কবে পূরণ হবে?

আশরাফ আলী

আমি নিচে অর্থনৈতিক উন্নয়নের একটি নীতিগত অবস্থানের নক্সা এঁকেছি এবং সেই অবস্থান বাস্তবায়নের জন্য দুটি দরকারী পদক্ষেপের বর্ণনা করেছি। আমি মনে করি, বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন সত্যিকার অর্থে শুরু করার কাজে এই পদক্ষেপ দুটি কার্যকরী ভূমিকা রাখতে পারবে। এখানে আমার লক্ষ্য দ্বিবিধ:

(১) বিশ্বের কোথাও সমমনা চিন্তাবিদ আছেন কিনা তা খুঁজে বের করা, এবং
(২) এই চিন্তাধারাকে বাস্তবায়িত করার উদ্দেশ্যে একটি বিশ্বব্যপী চিন্তাবিদ জোট তৈরী করা।

—— § ——

আমরা বাংলাদেশকে অদূর ভবিষ্যতে একটি মধ্যবিত্তশালী দেশ হিসাবে দেখতে চাই। আমি বিশ্বাস করি এই রকম একটি প্রস্তাবনায় কেউ অমত হবেন না। সুতরাং, এই লক্ষ্য বাস্তবায়নের কাজে যেসব নীতিমালা ও কার্যক্রম গ্রহণ করা প্রয়োজন সেগুলির প্রতি আমাদের সবার দ্বিধাহীন সমর্থন ও মদদ যোগানো উচিত।

ধরা যাক মধ্যবিত্তশালী দেশের মাথাপিছু বাৎসরিক আয় ৩০০০ থেকে ৫০০০ মার্কিন ডলারের মধ্যে হবে। বাংলাদেশের বর্তমান বাৎসরিক মাথাপিছু আয় ৫০০ মার্কিন ডলারের কাছাকাছি। মাথাপিছু আয় ৫০০ মার্কিন ডলার থেকে ৩০০০/৫০০০ ডলারে বাড়িয়ে আনতে বাংলাদেশকে কমপক্ষে (ক) টেকসই, (খ) আধা-প্রস্তুত ও (গ) পুঁজিপণ্যের অংশবিশেষ, যেমন, খুচরো যন্ত্রাংশ উৎপাদনের কাজ শুরু করতে হবে। আপনাদের মনে প্রশ্ন জাগতে পারে এই তিন শ্রেণীর পণ্য বিশেষভাবে বাছাই করে নেওয়া হয়েছে কেন। এখানে এর একটি সহজ ব্যাখ্যা দেওয়া হলো।

যে-কোনো পণ্য উৎপাদনে দুটি উপাদান প্রয়োজন : কাঁচামাল ও মানব শ্রম/বুদ্ধিবৃত্তি। সুতরাং, পণ্য উৎপাদন খরচ = কাঁচামাল + মানব শ্রম/বুদ্ধিবৃত্তি। বিশ্বের উন্নত ও অনুন্নত সব দেশের উৎপাদন প্রক্রিয়াতে কাঁচামাল একই ভাবে যোগ হয়। যে-কোনো পণ্যের মূল্য নির্ধারণে কাঁচামালের বস্তুগত অবদান পণ্য ও দেশ বিশেষে অভিন্ন থেকে যায়। কিন্তু মানব শ্রম/বুদ্ধিবৃত্তি পণ্য-বিশেষে অনেক ভিন্ন হতে পারে। যেমন, ঝুড়ি, কোদাল, শাবল, দা ও কাঁথা জাতীয় সহজ-সরল পণ্য উৎপাদনে জটিলতাহীন শ্রম/বুদ্ধিবৃত্তি ব্যবহার হয় এবং এই বুদ্ধিবৃত্তি যে-কেউ সহজেই অনুকরণ করতে পারে। এ-কারণে এই ধরনের পণ্যের মোট মূল্য তুলনামূলকভাবে অনেক কম এবং যে-দেশে এইসব সহজ-সরল পণ্যই কেবল উৎপাদিত হয় এবং উপরোক্ত তিন শ্রেণীর পণ্য আদৌ উৎপাদিত হয় না, সে-দেশের মাথাপিছু পায় তুলনামূলকভাবে কম হতে বাধ্য।

অপরপক্ষে, টেকসই পণ্য (যেমন, গাড়ি, ফ্রিজ, টেলিভিশন, টেলিফোন, মাইক্রোওয়েভ, ইত্যাদি), আধা-প্রস্তুত দ্রব্য (যেমন, ওষুধ ও আসবাব, ইত্যাদি প্রস্তুতের জন্য প্রয়োজনীয় জটিল রসায়নিক দ্রব্য) ও পুঁজিপণ্য (যেমন, ভোগ্যপণ্য উৎপাদনে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি) উৎপাদনে জটিল ও দুস্প্রাপ্য কারিগরি জ্ঞানের প্রয়োজন। এ-ধরনের জ্ঞান সহজে অনুকরণ করাও সম্ভব নয়। ফলে, এই জাতীয় পণ্যদ্রব্যের দাম তুলনামূলকভাবে অনেক বেশী এবং শিল্পোন্নত দেশগুলি এই জাতীয় পণ্য উৎপাদন ও বাজারজাত করে বলে তাদের মাথাপিছু আয়ও তুলনামূলকভাবে অনেক বেশী।

বাংলাদেশের মাথাপিছু আয় বাড়িয়ে ৩০০০/৫০০০ মার্কিন ডলারে আনতে গেলে স্বদেশে এই তিন প্রকার পণ্য উৎপাদনের ব্যবস্থা করতে হবে। মনে রাখতে হবে, এইসব পণ্য উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় আর-এণ্ড-ডি (গবেষণা ও উন্নয়ন কাজ) স্বদেশে সম্পাদন করতে হবে - সর্বোচ্চ পর্যায়ের আর-এণ্ড-ডি না হলেও কমপক্ষে মাঝারি পর্যায়ের আর-এণ্ড-ডি বাংলাদেশের মাটিতে এবং বাংলাদেশের বুদ্ধিবৃত্তি/কোম্পানী/বিশ্ববিদ্যালয় দ্বারা সম্পন্ন করতে হবে।

কিন্তু বাংলাদেশের বর্তমান শুল্ক-কাঠামো স্বদেশে এই তিন শ্রেণীর পণ্য উৎপাদনের অনুকুল নয়। উদাহরণস্বরূপ, ১৯৯০ দশকে এসব পণ্য উৎপাদনে ব্যবহৃত কাঁচামাল আমদানির উপর শুল্কের মাত্রা ছিল অনেক চড়া - ৫০% থেকে ১৫০% এবং সাম্প্রতিককালে এই শুল্ক কিছুটা কমলেও এখনো তার মাত্রা ২৫% থেকে ৫০%!

বাংলাদেশের শত শত উদ্যোক্তা উপরোক্ত তিন শ্রেণীর পণ্য উৎপাদনে সক্ষম। কিন্তু একদিকে কাঁচামালের অস্বাভাবিক চড়া দাম এবং অপরদিকে আর-এণ্ড-ডি, পর্যাপ্ত বিদ্যুৎ সরবরাহ, পুঁজি-ঋণ ও জমির অভাবে এই উদ্যোক্তারা এসব পণ্য উৎপাদনে সফল হন না। তদুপরি, টেকসই, আধা-প্রস্তুত ও পুঁজিপণ্যের উপর বসানো আমদানি শুল্ক অত্যন্ত কম হওয়ার করণে তা ‘‘মরার উপর খাড়ার ঘা’’-র মতো কাজ করে। পুরো ব্যাপারটা এইভাবে কাজ করে:

(১) এসব শিল্পে ব্যবহৃত কাঁচামাল দেশের বাইরে থেকে আমদানি করতে হয়। আমদানি শুল্ক অস্বাভাবিকভাবে চড়া হওয়ার কারণে এসব শিল্পে উৎপাদন খরচ অনেক বেড়ে যায় এবং ফলস্বরূপ স্থানীয়ভাবে উৎপন্ন পণ্যের দামও অনেক বৃদ্ধি পায়।

(২) এই জাতীয় পণ্যের উপর বসানো আমদানি-শুল্কের হার অত্যন্ত কম। ফলে স্থানীয়ভাবে নির্মিত বিকল্পের তুলনায় আমদানিকৃত পণ্যের দাম অনেক কমে যায়।

(৩) ফলতঃ, স্থানীয় নির্মাতাগণ স্বদেশী বাজারের ভাগীদার হওয়া থেকে বঞ্চিত হন।

বাংলাদেশের অভ্যন্তরে এসব পণ্যের মোটা অঙ্কের ‘‘চাহিদা’’ রয়েছে যা স্থানীয় উদ্যোক্তাদের ধরাছোঁয়ার বাইরে রয়ে যায় কারণ স্থানীয় উদ্যোক্তারা আমদানিকৃত পণ্যের সাথে প্রতিযোগিতায় হেরে যান। জাইদ বখ্‌ত্ , মোহাম্মদ ইউনুস ও মোহাম্মদ সলিমুল্লাহ ২০০২ সনের মার্চ মাসে ‘‘বাংলাদেশের যন্ত্রশিল্প’’ শীর্ষক একটি রিপোর্টে লিখেছেন, ‘‘এই ধরণের শুল্ক-অনিয়ম বাংলাদেশের আভ্যন্তরীণ যন্ত্রশিল্পে একটি ঋণাত্মক কার্যকরী প্রতিরক্ষা হার সৃষ্টি করেছে’’। অন্য কথায়, বাংলাদেশের বর্তমান শুল্ক-কাঠামো টেকসই, আধা-প্রস্তুত ও পুঁজিপণ্য শিল্প বিকাশের পরিপন্থী।

ঠিক এই কারণে আমি অন্যত্র বলেছি, বাংলাদেশের অর্থনীতি ‘‘সরবরাহ’’ সমস্যা নয়, বরং ‘‘চাহিদা’’ সমস্যায় আক্রান্ত। ‘‘সরবরাহ’’ বলতে আমরা সব রকমের ‘‘শিক্ষা’’র যোগান সহ ‘‘কারিগরি ক্ষমতা’’ সরবরাহের কথা বলছি।

এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত। এর অর্থ হলো, একবার শুল্ক-অনিয়ম অপসারণের মাধ্যমে স্থানীয় অবদমিত চাহিদা মুক্ত করে দিলে সরবরাহের দিকটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে সমাধান হয়ে যাবে (‘সরবরাহ’ দিকটির বর্তমান অবস্থা ও শক্তিমত্তা নীচে বর্ণনা করা হয়েছে) এবং চাহিদা-সংক্রান্ত সমস্যা সমাধান না করে সরবরাহ সমস্যা সমাধানের জন্য অযথা সময় ও উদ্যম ব্যয় করা উচিৎ হবে না। এর থেকে আরো বোঝা যায় যে, বিদেশ থেকে ‘‘কারিগরি জ্ঞান স্থানান্তরণ’’ করার জন্য সক্রিয় উদ্যোগ নেবার প্রয়োজন নেই।

বাংলাদেশের টেকসই ও পুঁজিপণ্য শিল্পে সুপ্তাবস্থায় ও বাস্তবে বিশাল উৎপাদন-ক্ষমতা বিরাজ করছে বলে প্রমাণ পাওয়া যায়। স্ট্রাথক্লাইদ বিশ্ববিদ্যালয়ের (গ্লাসগো, যুক্তরাজ্য) অর্থনীতির

অধ্যাপক মোজাম্মেল হক ১৯৯৩ সালে বাংলাদেশ যন্ত্র-নির্মাণের উপর একটি বই লেখেন। আমরা উপরে দেখেছি, বি-আই-ডি-এস প্রতিষ্ঠানের গবেষক জাইদ বখ্‌ত্ ২০০২ সনে একই বিষয়ের উপর একটি রিপোর্ট লিখেছেন।

এই বই ও রিপোর্টের মাধ্যমে বিশেষতঃ দুটি বিষয় জানা যায়:

(ক) বাংলাদেশের টেকসই ও পুঁজিপণ্য শিল্পে বিশাল উৎপাদন-ক্ষমতা রয়েছে এবং
(খ) এই শিল্পে আরোপিত প্রতিকুল শুল্ক-ব্যবস্থার কারণে স্থানীয় উদ্যোক্তাদের দ্রব্য-চাহিদা দুঃখজনকভাবে অবদমিত হয়ে রয়েছে।

বাংলাদেশ যেসব টেকসই ও পুঁজিপণ্য উৎপাদন করতে সক্ষম এবং বেশ কিছুকাল ধরে উৎপাদন করে আসছে তার ছোটো একটি তালিকা এখানে দেওয়া হোলো :

মোটরগাড়ি, রেলওয়ে, পাটকল ও বস্ত্রকলের খুচরো যন্ত্রাংশ; বল প্রেস, পাওয়ার প্রেস, স্বয়ংক্রিয় তাঁত, হাইড্রোলিক প্রেস, প্লাসটিক মেশিন, লাইনার, পিসটন ও পিসটন রিং লোড স্প্রিং, নাট ও বল্টু, তালা, বাংলাদেশ বিমান-বন্দরে ব্যবহৃত যন্ত্রাংশ, ফ্যান ও বৈদ্যুতিক মোটর, আধুনিক প্রযুক্তি-নির্মিত বিস্কুট তৈরীর যন্ত্র, সার কারখানায় ব্যবহৃত আধুনিক মানের যন্ত্রাংশ, তিতাশ গ্যাসে ব্যবহৃত খুচরো যন্ত্রাংশ, সেলাই যন্ত্র, উন্নতমানের স্যানিটারি বাথরুম ফিটিংস, হার্ডওয়ার দ্রব্যাদি; পানি উন্নয়ন বোর্ড, শক্তি উন্নয়ন বোর্ড ও 'ওয়াশা'য় ব্যবহৃত খুচরো যন্ত্রাংশ; বিবিধ মেশিনের খুচরো যন্ত্রাংশ; বিভিন্ন আকারের লেদ মেশিন, মিশ্রণ মেশিন, গ্যাস স্টোভ, থ্রেড মেশিনের প্লাসটিক ডাইস, তিন-চাকার অটো টেম্পো, মোটরগাড়ির রেডিয়েটর, ইত্যাদি।

বাংলাদেশের অভ্যন্তরে মোটা অঙ্কের চাহিদা থাকা সত্ত্বেও শুল্ক-অনিয়মের কারণে এইসব পণ্যের আভ্যন্তরীণ উৎপাদন হুমকির সম্মুখীন হচ্ছে অথবা একেবারে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। জাইদ বখ্‌ত্ এবং মোজাম্মেল হক বলেছেন, এই শুল্ক অনিয়ম একটি ঋণাত্বক কার্যকরী প্রতিরক্ষা হার সৃষ্টি করে এবং ফলতঃ এইসব পণ্যের আভ্যন্তরীণ উৎপাদনকে নিরুৎসাহিত করে।

বাংলাদেশী মানুষ এই ধরনের টেকসই পণ্যদ্রব্য, যেমন, ফোন ও মোবাইল ফোন, মোটরগাড়ি, টেলিভিশন, ফ্রিজ, কম্পিউটার, ট্রেন, বাস, বিমান, ইঞ্জিন, মোটর, জেনেরেটর, ইত্যাদি সব সময় ব্যবহার করছে। আমি একটি পরিসংখ্যানে দেখতে পাচ্ছি, ২০০৮ সনে প্রতি ১০০ জন বাংলাদেশীর মধ্যে ২৮ জন মোবাইল ফোন ব্যবহারের জন্য পয়সা দিয়েছে। আমরা বাংলাদেশীদের এইসব সর্বজন-গৃহীত পণ্যদ্রব্য ব্যবহার করা থেকে বিরত রাখতে পারি না - তারা কম্পিউটার, টেলিভিশন, মোবাইল ফোন, ফ্রিজ, মোটরগাড়ি, ইত্যাদি পণ্য ব্যবহার অব্যাহত রাখবে।

যদি বাংলাদেশীরা স্বদেশে উৎপাদনছাড়াই এইসব টেকসই ও পুঁজিপণ্যের ব্যবহার অব্যাহত রাখে এবং যেহেতু টেকসই ও পুঁজিপণ্য উৎপাদন-কাজে সর্বোচ্চ পর্যায়ের বুদ্ধিমত্তা নিযুক্ত হয়, সেহেতু আমরা দেশের অভ্যন্তরে উচ্চ-পর্যায়ের বুদ্ধিবৃত্তি প্রতিষ্ঠা, চর্চা ও সংরক্ষণ করার সুযোগ থেকে সজ্ঞানে ও ইচ্ছাকৃতভাবে বাংলাদেশকে বঞ্চিত করছি। একই সাথে আমরা শিল্পোন্নত দেশ থেকে এইসব পণ্য আমদানী ক'রে ব্যবহার করার মাধ্যমে শিল্পোন্নত দেশে উচ্চ-মার্গীয় বুদ্ধিবৃত্তির প্রবৃদ্ধি, চর্চা ও সংরক্ষণে মদদ যোগাচ্ছি। মূলকথা হোলো, যেসব দেশ যথোপযুক্ত আর-এণ্ড-ডি সহযোগে টেকসই ও পুঁজিপণ্য উৎপাদন করবে সেদেশ দুষ্প্রাপ্য উচ্চ-মার্গীয় বুদ্ধিবৃত্তি ব্যবহার, চর্চা ও সংরক্ষণ করতে সক্ষম হবে এবং সেদেশের মাথাপিছু আয় বেশী হবে। তাই বাংলাদেশে টেকসই ও পুঁজিপণ্য অথবা এগুলির খুচরাংশ উৎপাদন শুরু না করলে মাথাপিছু আয় বাড়বে না।

আমি কাউকে কাউকে এই ধরনের যুক্তি দিতে দেখেছি: যন্ত্র স্বদেশে নির্মাণ না ক'রে আমদানী

করা ভাল কারণ তাতে ‘দেখে শেখা’র সুযোগ ঘটে। কিন্তু আমরা যদি বাংলাদেশের টেকসই ও পুঁজিপণ্য শিল্পে বিরাজমান বিশাল উৎপাদন ক্ষমতা হিসাবের মধ্যে ধরি এবং স্বীকার করে নেই যে, বাংলাদেশ ‘‘সরবরাহ’’ নয়, বরং ‘‘চাহিদা’’ সমস্যায় আক্রান্ত, তাহলে আমাদের পরিকল্পনায় ‘প্রযুক্তি স্থানান্তরণ’, ‘প্রযুক্তি প্রশিক্ষণ’, ‘কারিগরি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা’, ‘মৌলিক স্তরে কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রদান’, ইত্যাদি ‘‘সরবরাহ’’ সংশ্লিষ্ট সমস্যাগুলিকে অগ্রাধিকার দেওয়া উচিৎ হবে না।

পুরো প্রক্রিয়াটি কিভাবে কাজ করে তা আরেকটু পরিষ্কার করে দেখার জন্য আসুন আমরা দুটি বিপরীতধর্মী ধারণাকে পাশাপাশি বসিয়ে তুলনা করে দেখি:

১। সঠিক মতবাদ: বাংলাদেশ চাহিদা সমস্যায় আক্রান্ত এবং সে-কারণে

ক। টেকসই, আধা-প্রস্তুত ও পুঁজিপণ্য উৎপাদনে ব্যবহৃত কাঁচামাল ও অন্যান্য উপাদান আমদানির উপর শুল্কহার কমিয়ে এবং এইসব পণ্যের সরাসরি আমদানির উপর শুল্কহার বাড়িয়ে আমাদের প্রথমতঃ এই শিল্পে বিরাজমান শুল্ক-অনিয়মটি মেরামত করতে হবে (মনে রাখতে হবে, এ-পর্যন্ত্য আমরা শুল্ক-কাঠামোকে ‘‘ন্যায্য’’ করার কথা বলেছি। মাহাথির মোহাম্মদের মতো দেশ-প্রেমিক জাতীয়তাবাদী নেতারা চড়া আমদানি শুল্ক বসিয়ে মৌলিক শিল্পগুলিকে প্রতিরক্ষা করেছিলেন। উদাহরণস্বরূপ, ‘‘প্রোটোনসাগা’’ তথা দেশজ মোটরগাড়ি শিল্প সুপ্রতিষ্ঠিত ও প্রতিরক্ষা করার স্বার্থে ডঃ মাহাথির মোহাম্মদ মোটরগাড়ি আমদানির উপর শতকরা ৩০০ ভাগ শুল্ক বসিয়ে দিয়েছিলেন!)।

খ। এর ফলে আভ্যন্তরীণ উৎপাদন খরচ কমবে এবং স্থানীয় উদ্যোক্তারা আভ্যন্তরীণ ‘‘চাহিদা’’র ভাগীদার হতে পারবেন।

গ। এর থেকে যে বাড়তি আয় হবে তা আর-এণ্ড-ডি-তে লাগিয়ে পণ্যের গুণগত মান বাড়ানো যাবে।

ঘ। এভাবে উদ্যোক্তাদের হাতে বাড়তি বিক্রি থেকে অর্জিত মুনাফা জমা হবে এবং তাঁরা তখন আর-এণ্ড-ডি-র খোঁজে কারিগরি বিশ্ববিদ্যালয় ও শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের দারস্থ হবেন। বাংলাদেশে স্নাতক, মাস্টার্স ও ডক্টরেট, অর্থাৎ সর্বস্তরে কারিগরি শিক্ষা চালু ও লালন করার এটিই মোক্ষম পন্থা।

ঙ। উদ্যোক্তারা এভাবে উন্নতমানের পণ্য দিয়ে তাঁদের বাজারের ভাগ বাড়াতে পারবেন।

২। ভুল পন্থা : আমরা যদি ভুল পথে এগোয় এবং বলি যে, ‘‘বাংলাদেশ ‘সরবরাহ’ সমস্যায় আক্রান্ত’’, তাহলে

ক। আমরা আরো কারিগরি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করবো এবং মৌলিক কারিগরি প্রশিক্ষণের প্রসার ঘটাতে তৎপর হবো। কিন্তু তারপর কি হবে? যেহেতু প্রতিকুল (দেশদ্রোহী?) শুল্ক-কাঠামো আরোপের মাধ্যমে আমরা স্বদেশী টেকসই ও পুঁজিপণ্য শিল্প ধ্বংস করে ফেলেছি, সেহেতু দেশের অভ্যন্তরে এই গ্রাজুয়েটেরা তাদের প্রশিক্ষণ ও মেধা ব্যবহার বা উচ্চ শিক্ষা (মাস্টার্স ও ডক্টরেট) গ্রহণ করার কোনো সুযোগ পাবেন না।

খ। এর ফলশ্রুতি হিসাবে বাংলাদেশ থেকে মস্তিত্ব পাচারের হার বৃদ্ধি পাবে মাত্র।

টেকসই, আধা-প্রস্তুত ও পুঁজিপণ্য শিল্পের শুল্ক-কাঠামো সংশোধন করলে তা অর্থনীতির উপর

সবচেয়ে বড় প্রভাব ফেলবে বলে আশা করা যায়। এর কারণ হোলো, স্থানীয় আর-এণ্ড-ডি প্রয়োগের মাধ্যমে এই শিল্পের পণ্যদ্রব্য উৎপাদন করতে গেলে অনেক উঁচু পর্যায়ের বুদ্ধিবৃত্তির প্রয়োজন পড়বে এবং তাতে এই ধরনের পণ্যদ্রব্য অনেক বেশী পরিমাণ ''মূল্য'', অর্থাৎ মানব বুদ্ধিবৃত্তি শোষণ করবে। আপনারা সবাই জানেন, এই শোষিত মূল্যই হচ্ছে বাংলাদেশের মাথাপিছু আয় ৫০০ ডলার থেকে ৩০০০/৫০০০ ডলারে বাড়িয়ে আনার চাবিকাঠি।

অতএব, আমি এইসব পণ্য-সংশ্লিষ্ট শুল্ক-কাঠামো পুনর্বিন্যাস করার প্রস্তাব দিচ্ছি। আমার জানা মতে এই শুল্ক-কাঠামো সংশোধন করলে বাংলাদেশী উদ্যোক্তারা স্বদেশী বাজারের ন্যায্য ভাগীদার হতে পারবেন এবং অবশিষ্ট কাজগুলি তাঁরা নিজেরাই সম্পাদন করতে পারবেন। এই প্রস্তাব বাস্তবায়িত করার লক্ষ্যে আমরা নিম্ন-বর্ণিত দুটি বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারি :

১) বিরাজমান শুল্ক-কাঠামো সংশোধন ক'রে তাকে 'উৎপাদনমুখী ও জাতীয়তাবাদী' ক'রে তোলার জন্য আমরা বাংলাদেশী সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করতে পারি।

২) আমরা (ক) বাংলাদেশ সরকারের প্রতিনিধি, (খ) বাংলাদেশ টেকসই ও পুঁজিপণ্য শিল্পের উদ্যোক্তা এবং (গ) এ-এস-ই-এ-এন/ই-ইউ/ ইউ-এস-এ দেশগুলির প্রতিনিধিদের মধ্যে কর্মশালা আয়োজন করার কাজে সহযোগিতা করতে পারি। বি-ডি-আই (বাংলাদেশ উন্নয়ন উদ্যোগ - ওয়েবসাইট : *www.bdiusa.org*) এর মতো প্রতিষ্ঠান এই ধরনের কর্মশালা আয়োজনের জন্য প্রয়োজনীয় সাংগঠনিক যোগাড়-যন্ত্র করে দিতে পারে। এ-এস-ই-এ-এন অথবা ই-ইউ এর দেশগুলি অথবা ইউ-এস-এ কিভাবে দক্ষ ও আধা-দক্ষ বাংলাদেশী কর্মী ব্যবহার ক'রে বাংলাদেশ সীমানার মধ্যে তাদের টেকসই ও পুঁজিপণ্যের খুচরাংশ উৎপাদন করিয়ে নিতে পারে তা পর্যালোচনা করাই হবে এই কর্মশালার উদ্দেশ্য। এ-এস-ই-এ-এন অথবা ই-ইউ এর দেশগুলি অথবা ইউ-এস-এ তাদের উৎপাদন-খরচ কমানোর স্বার্থে এইরূপ ব্যবস্থা/চুক্তিতে রাজি হতে পারে। আমাদের কেবল নিশ্চিত করতে হবে যেন খুচরো যন্ত্রাংশ উৎপাদন-সংক্রান্ত আর-এণ্ড-ডি বাংলাদেশের মাটিতে এবং বাংলাদেশীদের দিয়ে সম্পাদিত হয়।

বিষয়টির উপর আরেকটু গুরুত্ব দেবার জন্য আমি আবার বলছি : চিন, দক্ষিণ কোরিয়া, তাইওয়ান, মালয়েশিয়া, ই-ইউ, অথবা ইউ-এস-এ, ইত্যাদি দেশগুলিকে উন্নয়নের অংশীদার হিসাবে পাওয়া খুব বেশী কঠিন হবে না, কারণ এই দেশ অথবা জোটগুলি এই অংশীদারিত্ব থেকে লাভবান হবে - ঠিক যেমন জাপান ১৯৭০, ১৯৮০ এবং ১৯৯০ দশকে এ-এস-ই-এ-এন অন্তর্ভূক্ত দেশগুলির সাথে অংশীদারিত্বে এসে লাভবান হয়েছিলো।

সবচেয়ে কঠিন কাজ হবে, সাচ্চা জাতীয় উন্ননয়ের উদ্যোগ গ্রহণ করাতে এবং সেই সূত্রে পুঁজিপণ্য, টেকসই পণ্য ও আধা-প্রস্তুত পণ্য-শিল্পে বিরাজমান শুল্ক-কাঠামো সংশোধন করাতে বাংলাদেশ সরকারকে রাজী করানো। বাংলাদেশকে অদূর ভবিষ্যতে মধ্যবিত্তশালী দেশ হিসাবে দেখার স্বার্থে আমি আপনাদের এই প্রস্তাবটিকে ভীষণ গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করার জন্য আবেদন জানাচ্ছি।